

# সাহিকোলডিক্যাল ফাইমিস

মানসিক ও সামাজিক বিকৃতি রোধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মূল | সাইয়িদা সাদিয়া গজনভি  
ভাষান্তর | খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

## ভূমিকা

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ আল্লাহ তায়ালায় কুদরতের এক অপার বিস্ময় ও নিপুণ সৌকর্যের নিদর্শন। চিন্তা, বোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজের চারপাশের পরিবেশ থেকে প্রভাব গ্রহণের সহজাত যোগ্যতা আছে তার। উপযুক্ত পরিবেশ ও নির্দেশনা পেলে সে ভালো কাজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। আবার ভুল শিক্ষা, অসৎ সঙ্গ, অনাদর আর বলিষ্ঠ আশ্রয়ের অভাবে সে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়; জড়িয়ে পড়ে নানাবিধ অপরাধে।

পাশ্চাত্যের কিশোর অপরাধীদের কেস স্টাডি করে দেখা দেখে গেছে—তাদের অধিকাংশই সেসব ছেলে, যাদের পিতা-মাতা শৈশবেই তাদের ছেড়ে চলে গেছে। এক অনুসন্ধান জানা গেছে—থাইল্যান্ডে প্রায় ৩০ সহস্রাধিক আশ্রয়হীন ছেলে অলিগলিতে দাপিয়ে বেড়ায়, যাদের নিজস্ব কোনো ঘর নেই। নৈতিক মূল্যবোধ, সভ্যতা-ভব্যতা, আদব-কায়দা শেখানোর মানুষরাই তাদের ফেলে গেছে ঘোর অনিশ্চয়তার পথে। এখন তারা চোর-ছিনতাইকারী ও মাদকসেবীদের ডেরায় বেড়ে উঠছে। বেঁচে থাকছে দুর্বৃত্তদের আশ্রয়ে। মাদক ব্যবসা-ই হয়ে উঠছে তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন।

আমাদের চারপাশে এসব সমস্যা এতটাই গভীর, ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী যে, চাইলেও চোখ বন্ধ করে বসে থাকার উপায় নেই; বরং এই সংকটে যারা চোখ বুজে থাকবে, অপরাধের পরোক্ষ মদদ ও সমর্থনের দায় তাদের ওপরও বর্তায়। আজকের সমাজে মানুষ জীবন-জটিলতার এমন এক আবর্তে ফেঁসে গেছে যে, অন্যের জন্য কিছু সময় ব্যয় করবে—সেই মানসিকতাও কারও নেই! পাশ্চাত্য জীবনবোধ পৃথিবীকে ব্যক্তিস্বাধীনতার এই অদ্ভুত তত্ত্ব উপহার দিয়েছে। ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থের বাইরে অন্যের ভালো-মন্দ কোনো বিষয়ে মাথা ঘামানোর আগ্রহ দেখাবে না। অন্যের বিষয়ে চিন্তা করা নাকি সভ্যতা পরিপন্থি! ঠিক যেভাবে কাশ্মীরে ভারতীয় জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল! কাজেই ভারত এই ধরনের নিন্দা ও প্রতিবাদ আমলে নিতে নারাজ।

সম্প্রতি অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক শিক্ষিত তরুণ ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। অভাবের পীড়ন কিংবা দারিদ্র্য তাকে ছিনতাই করতে তাড়িত করেনি। তার প্রয়োজন পূরণের জন্য সামর্থ্যবান অভিভাবক ছিল। সে নিজেও একজন পড়ালেখা জানা মানুষ। সচ্ছল পরিবারে জন্ম নেওয়া এসব তরুণ না চাইতেই হাতের কাছে পেয়ে গেছে উন্নত জীবনের সমুদয় উপকরণ। অভাব কখনো তাদের স্পর্শ করেনি। তা সত্ত্বেও তারা এমন গর্হিত অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। হতে পারে, তাদের পিতা-মাতা নিজেদের একান্ত ব্যস্ততায় এত বেশি ডুবে ছিলেন যে, সন্তানের গতিবিধি লক্ষ করার মতো ফুরসতই হয়ে ওঠেনি কোনোদিন।

ঘটনার নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করলে আগামীর জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি সন্তানের ভুল আচরণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের কারণ নিয়ে গবেষণার জন্য এত প্রশিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী কোথায় পাবেন, যারা অসংখ্য ছেলেমেয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার জন্য মাঠে নেমে পড়বেন?

পিতা-মাতা নিজেরাই পেরেশান, সন্তান কেন তাদের কথা শোনে না! কেন ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল তাদের প্রত্যাশার অনুরূপ নয়! আজকালের অভিভাবক নিজেদের অর্থবিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে ছলে-বলে প্রত্যাশিত ফলাফল ঘরে তুলতে মরিয়া। সন্তানের মনস্তাত্ত্বিক উন্নতির জন্য সহায়ক না হওয়া সত্ত্বেও অভিভাবক নিরুপায় হয়ে অনেকটা আত্মসমর্পণ করে প্রাইভেট টিউশনের ওপর।

এই সমস্যাগুলোর প্রত্যেকটিই টেকসই সমাধানের দাবি রাখে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে বটে, কিন্তু প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য কোনো সামগ্রিক সমাধান উপস্থাপন করে না। এমন কোনো ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব করে না—যাতে মাদকের ছোবলে নিঃশেষিত ছেলেটাকে শুধরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।

এই তথাকথিত আধুনিক মনোবিজ্ঞান তো মানুষকে পশুর কাতারে নামিয়ে এনেছে। মনুষ্যত্বকে উজ্জীবিত করার পরিবর্তে এটি আঘাত করেছে খোদ ব্যক্তিত্বে। অথচ মানুষ রোবট নয়; তার চিন্তা, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি মানসিক অবস্থাও স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক বিন্যাসের মতো নয়। মানুষের ওপর বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন আরও আলাদা কিছু, যার মধ্যে বৃহৎ একটি অংশ নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে মহাসত্য। তিনি মানুষের জীবন সহজে পরিচালিত হওয়ার জন্য পৃথিবীকে একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে সাজিয়েছেন। আর এখান থেকে উপকৃত হওয়ার নিয়মনীতি ও রীতি-পদ্ধতি শেখানোর জন্য যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন পথপ্রদর্শক। তাঁরা ব্যবহারিক জীবনের মানবীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে আমাদের কেবল পরিচিতই করাননি; একই সঙ্গে নিজেদের কর্মধারাকে তুলে ধরেছেন আমাদের জন্য আদর্শ নমুনা হিসেবে।

মনোদৈহিকভাবে সুস্থ থাকার সঠিক পন্থা কী? কুরআন বলছে, মহানবির জীবনাদর্শের মধ্যেই রয়েছে মানবজাতির সর্বোচ্চ কল্যাণ। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-

‘তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ সূরা আহজাব : ২১

চলন-বলন, আচার-আচরণ, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রেই নয়; বরং সামগ্রিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেই নবিজি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। তাঁর কথা বলার ধরন ও আঙ্গিক এমন ছিল যে, মুহূর্তেই মানুষের মন জয় করে নিতেন। অনুপম সৌন্দর্যের সমাহার ঘটেছিল তাঁর জীবনজুড়ে। তিনি ছিলেন সবার মাঝে অনন্য, অবাক বিস্ময়ের আঁধার। কখনো স্নেহবৎসল পিতা,

কখনো-বা পরম সহনশীল বন্ধু। আবার কখনো তিনি এমন জানবাজ যোদ্ধাদের কমান্ডার, যারা সামান্য চোখের ইশারায় গর্বভরে অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত। সদাচার থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, বিচারব্যবস্থা অথবা দৈনন্দিন জীবনযাপন, মনোবিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসাবিদ্যা—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক পদক্ষেপে মানবসন্তানের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রাসূল ﷺ।

উন্নত সভ্যতার দাবিদার ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজিত অঞ্চলসমূহে যে লজ্জাজনক কর্মকাণ্ড করেছে, মানবজাতি আজ পর্যন্ত সেই ক্ষত সেরে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে বিজয়ের জন্য মরণপণ লড়াকু মক্কা বিজয়ী সৈন্যদের নবিজি যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার স্বরূপ বোঝা যায় পরাজিত সৈন্যদের সাথে তাঁদের আচরণে। ভেবে দেখুন, কেমন ছিল তাদের অনুভূতি, যখন তাদের বলা হলো—‘যাও, আজকে কারও ওপর কোনো প্রতিশোধ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত।’ তরবারির জোরে নয়; বরং চারিত্রিক সুষমা আর ভালোবাসা দিয়েই বিশ্বজয়ের কৌশল শিখিয়েছেন মুহাম্মাদ ﷺ।

মানুষের শরীর ও মনোজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়ার ডায়াগনোসিস ও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয়ে নবিজির জ্ঞানভান্ডার এত বিস্তীর্ণ ছিল যে, অনাগত প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক সূত্রগুলো সুন্দরভাবে পেশ করে গেছেন তিনি। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন হীনম্মন্যতা, বৈষম্য আর নীচতাবোধকে। অহমিকায় উড়ন্ত অভিজাত আরব জাতির মেয়েদের সাথে কালো হাবশি পুরুষদের বিবাহ রীতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দেখিয়েছেন—মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, থাকতে পারে না। গায়ের বর্ণ বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভালো-মন্দ বিবেচিত হয় না; বরং মর্যাদা নির্ধারিত হয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়, সেবা আর চরিত্রের গুণে।

নবিজি নির্মিত সমাজকাঠামো ছিল নানা মাত্রায় বিকশিত ও পরিব্যাপ্ত। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না কেন, একের পর এক কল্যাণকর বিষয় উদ্ভাসিত হতে থাকবে। অতি পরিচিত ইবাদত নামাজের কথাই ধরা যাক। এটি কেবল আল্লাহর প্রতি ব্যক্তিগত প্রার্থনা প্রকাশের কোনো উপলক্ষ্যই নয়; বরং একাকিত্বের সংকীর্ণ বাতায়ন হতে সমাজের উন্মুক্ত উদ্যানে মিলিত হওয়ার চমৎকার বন্দোবস্ত। যারা নিয়মিত মসজিদের জামাতে শরিক হয় না, নিজেদের ডুবিয়ে রাখে একাকিত্বের কষ্টে, দিনশেষে তারাই ছিটকে পড়ে জনবিচ্ছিন্নতার অন্ধকার কুঠুরিতে। ইসলাম পারস্পরিক কল্যাণের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। এসব কল্যাণকর দিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে রাসূলের মূল্যবান নির্দেশনাসমূহ প্রথমবারের মতো আলোকপাত করেছেন সাদিয়া গজনভি। এ যেন ঠিক বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা। বৃষ্টির এই প্রথম পশলায় প্রাত্যহিক জীবনের ভাসাভাসা পর্যালোচনা নয়; বরং পেশ করা হয়েছে জীবন সন্নিহিত নিখুঁত ব্যবস্থাপত্র।

মনোবিজ্ঞান বিষয়ে মানবসমাজের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশিত উপহারগুলো সংকলনের মধ্য দিয়ে সাদিয়া গজনভি অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রত্যাশা এই—এমন কল্যাণময় মহৎ কীর্তির ধারা ভবিষ্যতেও বহমান থাকবে।

# সূচিপত্র

নির্ভর মন ও মানসিক শক্তি	১৯
◊ আতঙ্ক ও উদ্বেগ	২০
◊ মনের জরা : কুরআন ও মনোবিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা	২১
◊ ভয় সম্পর্কিত বর্ণনায় কুরআনের স্বাতন্ত্র্য	২৩
◊ ভয়ের প্রকৃতি : উত্তরণের নীতি-কৌশল	২৭
◊ মানসিক চাপ দূর করার টোটকা	২৯
অপরাধবোধ	৩৩
◊ পাপ ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত	৩৫
◊ ইসলাম ও অপরাধবোধ	৩৭
হীনম্মন্যতাবোধ	৪৩
◊ হীনম্মন্যতা ও ইসলামের নির্দেশনা	৫১
ফ্যাশনে রুচির বিকৃতি ও মানসিক অসুস্থতা	৫৫
স্বপ্নলোকের নানান কথা	৬০
◊ স্বপ্ন ব্যাখ্যার সনাতন পদ্ধতি	৬২
◊ পুরোনো ধর্মবিশ্বাস	৬৩
◊ দুঃস্বপ্ন	৬৫
◊ ঘুমের মধ্যে হাঁটাচলা	৬৬
◊ বিছানায় মূত্রত্যাগ	৬৭
◊ ইন্তেখারা কী	৬৮
◊ মস্তিষ্কের জানালা	৬৯
◊ কুরআন মাজিদ ও স্বপ্ন	৭২
◊ ইউসুফ (আ.) ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা	৭৩
◊ মহানবি ﷺ ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা	৭৫
◊ বিষণ্ণ নারী	৭৮
◊ তরবারি চালনা	৭৮
◊ আরও কয়েকটি স্বপ্ন	৭৯

<b>বিয়ে ও বিয়েকেন্দ্রিক জটিলতার সমাধান</b>	<b>৮৮</b>
◊ সভ্যতায় বিবাহব্যবস্থা ক্রমবিকাশের ধারা	৮৯
◊ হিন্দু ধর্মে বিয়ে : নারী নিগ্রহ ও আত্মহত্যার পথঘাট	৯১
◊ শিখ ধর্মে বিয়ে	৯২
◊ পারস্যে বিয়ে-শাদি	৯৩
◊ খ্রিষ্টান ধর্মে বিয়ে ও বৈরাগ্য	৯৪
◊ বিয়ের নতুন রীতি	৯৬
◊ ইসলামে বিয়ে ও তালাকব্যবস্থা	৯৮
◊ ইসলামে বিয়ের আয়োজন ও অন্যান্য কাজ	১০০
◊ নবজির ম্যারেজ কাউন্সিলিং ও নারী অধিকার প্রসঙ্গ	১০২
◊ ইসলামে তালাকের বিধান	১০৩
◊ বিয়েকেন্দ্রিক জটিলতার সমাধান	১০৫
<b>মাদকাসক্তি</b>	<b>১০৮</b>
◊ ওষুধ শিল্পে মাদক : মধুর মোড়কে বিষ	১১৩
◊ মাদকের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব	১১৬
◊ মাদক নির্মূলে ইসলামের ব্যতিক্রমী মনস্তাত্ত্বিক কৌশল	১২১
◊ মাদকাসক্তি : সমস্যা ও সমাধান	১২৮
◊ মাদকাসক্তি নিরাময়	১২৯
<b>আত্মহত্যা ও ইসলাম</b>	<b>১৩৪</b>
◊ আত্মহত্যার আন্তর্জাতিক চিত্র	১৩৬
◊ আত্মহত্যার পদ্ধতি	১৪৫
◊ আত্মহত্যা কি সত্যিই প্রয়োজন	১৪৯
◊ আত্মহত্যার কারণসমূহ	১৫১
◊ আত্মহত্যার ইঙ্গনসমূহ	১৫৪
◊ আত্মহত্যা রোধে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা	১৫৯
◊ ইসলামে আত্মহত্যার সমাধান	১৬২

## নির্ভার মন ও মানসিক শক্তি

মৌলিক প্রবৃত্তি ও সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আনন্দ, উদ্বেগ, বিষাদ ও আতঙ্ক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মানুষ নিজের প্রতি কোনোরূপ ঝুঁকির আশঙ্কা করলে স্বভাবতই দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা আর তীব্র আতঙ্কবোধ তাকে গ্রাস করে। আর আকস্মিক কিছু ঘটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি হাজির হলে তো শরীর হিম হয়ে যায়, তাপমাত্রা কমে গিয়ে উদ্বেগ বিস্ফোরিত হয় চোখে-মুখে। বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটায় অনুভূতি, বেড়ে যায় হৃৎকম্পন। যেকোনো খারাপ ঘটনা শুনে বা দেখেই এমনটা হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর নাম দেওয়া হয়েছে Shock; বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে অভিঘাত। কিন্তু ‘Shock’ শব্দটিও পুরো অবস্থার ভয়াবহতা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। মানসিক দ্বন্দ্ব বিপর্যস্ত মানুষের মধ্যে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয়, যা বাহ্যিক অবয়বেও সহজে ধরা পড়ে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তখন এটাকে বলে ইমার্জেন্সি অব লাইফ।

ইংল্যান্ডে সার্জারির একটি উচ্চতর পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, ব্যথার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রোগীর প্রথম চিকিৎসা কী হবে? শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছিল, কিন্তু মোক্ষম উত্তরটি এসেছিল একজনের কাছ থেকে—‘A word of Comfort’ অর্থাৎ সান্ত্বনামূলক কয়েকটি বাক্য। এ ধরনের রোগীর জন্য মহানবি ﷺ চমৎকার একটি চিকিৎসার নির্দেশনা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু রামসা (রা.)-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন—

‘তোমার দায়িত্ব রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া, আরোগ্য দেওয়া তো আল্লাহরই কাজ।’  
মুসনাদে আহমদ : ১৭৫২৭

একাধিক হাদিসে নবিজির এই বক্তব্য নানাভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। এখানে একজন চিকিৎসককে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, সে যেন রোগীর প্রতি অযথা কৌতূহল না দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে অধিকতর মনোযোগী হয়। রোগীকে সাহস ও প্রবোধ দিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন, যাতে তার মন থেকে উদ্বেগ ও ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়। অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক ধকল কাটিয়ে তুলতে এটিই সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসাপদ্ধতি। কোনো মুসলমান ভাই অসুস্থ হলে মুমিন হিসেবে আপনার নৈতিক দায়িত্ব হলো তার খোঁজ নেওয়া। সেবা-শুশ্রূষা না হোক, নিদেনপক্ষে সান্ত্বনার

বাণী নিয়ে হাজির হওয়া। আবু সাইদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘তোমাদের মধ্যে কেউ রোগীকে দেখতে গেলে তাকে প্রাণিত করো, সাহস দাও। কেবল এতেই তার মনে শক্তি সঞ্চারিত হবে।’ ইবনে মাজাহ : ১৪৩৮

আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো রোগীকে দেখতে গিয়ে প্রথমে তার রোগের অবস্থা, লক্ষণ প্রভৃতি জিজ্ঞেস করতেন। এরপর বলতেন—

‘কোনো ভয় নেই, শীঘ্রই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।’ বুখারি : ৩৪২০

আপনার দেওয়া সামান্য সাহস ও সান্ত্বনায় দূর হয়ে যেতে পারে রোগীর মনের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা অজস্র দুর্ভাবনা আর উৎকর্ষ। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তির মনকে হালকা করার সুযোগ করে দিন। আল্লাহ চাইলে সে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে।

### আতঙ্ক ও উদ্বেগ

ভীতি ও উদ্বেগ প্রভৃতির অন্যতম প্রধান উৎপত্তিস্থল রোগব্যাপি। অনেক সময় সাধারণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছাড়াও পারিবারিক ও আত্মীয়তাকেন্দ্রিক সমস্যাবলি আপনার মানসিক অস্থিরতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। এসবের যেকোনো একটি ঘটলে তা প্রতিফলিত হবে ব্যক্তির মনোদৈহিক আয়নায়। ধরুন, বলা নেই কওয়া নেই আচমকা আপনার বাড়িতে পুলিশ এসে হাজির! এমতাবস্থায় আপনি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক থাকতে পারবেন না।

মনস্তত্ত্ববিদগণ বিপদ ও ভীতির মাঝে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ধারণ করে থাকেন। বিপদ হলো এমন আকস্মিক পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত বোধ করা, যার কোনো দৃশ্যমান চিত্র আছে। অপরদিকে ভীতি আর উদ্বেগের বসবাস মস্তিষ্কে। ভয়ের ধরন বিবেচনায় এর প্রতিরোধের উপায়ও হতে পারে বিভিন্ন রকম। কখনো অঝোরে কেঁদে, কখনো বা শোকে সংবিৎ হারিয়ে; এমনকী পালিয়ে গিয়েও মানুষ নিকৃতি পায় এসব অবস্থা থেকে। কিন্তু কোনো মুসলমান এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে কী করবে? কুরআন মাজিদ সেই নির্দেশনা দিচ্ছে—

‘সেসব ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ, যারা বিপদগ্রস্ত হলে বলে আমাদের কাছে যা কিছুই আছে—তা আল্লাহরই প্রদত্ত। আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব। তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণারশি ও রহমত বর্ষিত হয়। তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক।’ সূরা বাকারা : ১৫৫

এর ঠিক আগের আয়াতেই বলা হয়েছে—‘আল্লাহ সম্পদহানি ও ভয়ভীতির মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস ও দৃঢ় পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যারা সেসব কষ্টেও স্থির ও অবিচল থাকে, তারাই আখেরে ভূষিত হবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও মর্যাদায়।’



## মনের জরা : কুরআন ও মনোবিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ভয়ভীতির মাত্রা ও অনুভূতি আলাদাভাবে চিহ্নিত করার রীতি থাকলেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষণ্ণতা, ভয় ও হিংসা স্বতন্ত্র রোগ হিসেবে নিরূপিত (*Calculated*) হয়নি। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, বলা হলো—কাশি কোনো রোগ নয়; রোগের উপসর্গ মাত্র। বুকে কষ্ট, শ্লেষ্মা থাকলে কাশি আসা খুবই স্বাভাবিক। সর্দির রোগ থেকে শুরু করে ফুসফুসের ব্যাধি, ইত্যাকার বহুবিধ রোগের কারণেই এটি হতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান জ্বর কিংবা কাশির মতো হিংসাকেও আলাদা কোনো মানসিক রোগ হিসেবে স্বীকার করেন না। তাদের দাবি, এটি অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র; এমনকী তারা তো বলতে চায়—ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এগুলোর প্রত্যেকটাই ত্রুদ্রতার একেকটি প্রকার এবং ত্রুদ্রতাজাত উপসর্গ।

অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ মানসিক অসুস্থতার প্রতিটি প্রকার আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন, পৃথকভাবে মনোনিবেশ করেছেন তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আলোচনায়। আর এসব চিকিৎসার মূলনীতি বাতলে দিয়েছেন প্রথমেই—সবকিছুর আগে রোগীকে আশ্বস্ত করো, শক্তি ও সাহস জোগাও তার দুর্বল মনে। তার কথা শোনো পূর্ণ মনোযোগের সাথে, যাতে মনের যাবতীয় বেদনা উগরে দিয়ে সে হালকা করতে পারে। পরম করুণাময় প্রভুর নিকট তার জন্য আরোগ্য প্রার্থনা করো। যেকোনো চিকিৎসার ক্ষেত্রেই এমন Positive Transference বা ইতিবাচক রূপান্তর একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

তখন খন্দকের যুদ্ধ চলছে। শত্রুরা মদিনাকে ঘিরে ফেলেছে চারপাশ থেকে। সাঁকো বসিয়ে পরিখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে শত্রুসেনাদের কয়েকজন। রসদ ঘাটতি, জনবল সংকট আর অব্যাহত আত্মসনে মদিনাবাসী তখন মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত। আতঙ্কে সকলের কলিজা বেরিয়ে আসার জোগাড়! আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, এমন ভীতিকর পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করা হলো—

‘আমাদের সাহস বাড়ানোর জন্য কিছু বলুন।’

তিনি বললেন—‘তোমরা বারবার পড়তে থাকো—

“হে আল্লাহ! ভীতির বিপরীতে আমাদের নিরাপত্তা দান করুন। আর আমাদের দোষসমূহ রাখুন লুপ্তায়িত।” মসুনাদে আহমদ : ১১০০৯

## ফ্যাশনে রুচির বিকৃতি ও মানসিক অসুস্থতা

১৯৩৫ সালে জার্মানির ডাক্তার ম্যাকিংস হারশফিল্ড প্রথমবারের মতো এক অদ্ভুত রোগের খোঁজ পেলেন। তাঁর বিশ্লেষণী প্রবন্ধগুলোতে এটাকে তিনি নাম দিলেন ‘ফ্যাশনের রুচিবিকৃতি’। এর স্পষ্ট লক্ষণ হলো, রোগী পুরুষ হলে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করে নিজেকে মেয়েদের মতো করে উপস্থাপনের প্রতি প্রবল মোহ জাগবে তার। গোড়ার দিকে একাকী মেয়েলি প্রসাধনীতে সে নিজেকে সাজিয়ে আয়নায় পরখ করবে, এর মধ্য দিয়ে উপভোগ করবে এক অপরিমেয় তৃপ্তি। এরপর ক্রমাগত সে মেয়েলি মেকআপের পরিমাণ বাড়াতে থাকবে। সাজগোজের পর তাকে মনে হবে পুরোদস্তুর আবেদনময়ী এক তন্বী নারী। দিন দিন এরূপ চলনের ফলে তার পুলক অনুভূত হতে থাকবে। এরপর নীরবে-নিভৃতে এরূপ কাণ্ড সীমিত না রেখে একদিন স্বাচ্ছন্দ্যে হাজির হবে প্রকাশ্য লোকারণ্যে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই মেয়েলি আচরণ প্রতিভাত হয় আকার-ইঙ্গিতে। যেমন : মেয়েদের মতো লম্বা চুল কিংবা পায়ে নুপুর-ঘুঙুরের মতো অলংকার পেঁচিয়ে নেওয়া। অথচ একসময় বাবরি স্টাইলের লম্বা চুল ছিল গোত্রের সর্দারসুলভ আভিজাত্যের প্রতীক।

ম্যাকিংস হারশফিল্ড-এর প্রথম পর্যবেক্ষণ ও গবেষণালব্ধ অভিমত প্রকাশের পর ব্রিটেন ও আমেরিকার মনোবিদগণ অধিকতর গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, এটা শ্রেফ বাজে অভ্যাস বা মন্দ প্রবণতাই নয়; বরং রীতিমতো একটি মানসিক রোগ। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মন ও মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। ক্রমাগত সে তলিয়ে যেতে থাকে নিঃসঙ্গতা অলীক চিন্তার গহিন অন্ধকারে। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে হীনম্মন্যতার অন্য একটি রূপ।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মেয়েলি পোশাকে সজ্জিত থাকাবস্থায় এ ধরনের পুরুষের মধ্যে শতগুণ আত্মবিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। কোনো পুরুষ মেয়েলি পরিচ্ছদে উপস্থাপিত হলে সাধারণত সে লজ্জিত ও বিব্রত হওয়ার কথা; অথচ এই লোকগুলো বারবার নিজেকে মেয়েলি পোশাকে উপস্থাপন করলেই প্রবল আত্মবিশ্বাস বোধ করে।

প্রথমে অনেকের ধারণা ছিল, শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন কিছু লোক তাদের দুর্বলতার দরুন নিজেদের মহিলাদের মতো ভেবে সান্ত্বনার পথ বেছে নেয়। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, এই ধরনের বিকৃত ফ্যাশনগত রুচির শিকার লোকদের ৬৬ শতাংশই বিবাহিত। সবচেয়ে কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হলো, তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা আবার সংসারজীবনে সুখী।

একেবারে অক্ষরে অক্ষরে এই প্রবণতা মেয়েদের মধ্যেও দৃশ্যমান। সাধারণত মেয়েদের দেখা হয়

শারীরিকভাবে দুর্বল, রোজগার ও কায়িক শ্রমে অপারগ বর্গ আকারে। এই অবস্থার বিপরীতে নিজেদের পুরুষালি অবয়বে অধিকতর নিরাপদ মনে করে তারা। অপারগতার দিকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। জীবিকা উপার্জনের বাধ্যবাধকতার কথা বাদ দিলেও কতিপয় মহিলা অকারণে এমন পুরুষালি পোশাক-পরিচ্ছদেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। শুরুর দিকে পোশাকের হাতা কেটে কিংবা শার্টের আকারে গোলগলা জামা পরতে শুরু করে। প্যান্টের সঙ্গে পছন্দ করে পুরুষশোভন জামা আর স্লিম জুতা। একপর্যায়ে পুরুষালি কথাবার্তা ও বাচনভঙ্গিতে দক্ষ হয়ে ওঠে সে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—এদের অধিকাংশই নিজেকে দাবি করে ‘রূপান্তরিত পুরুষ’ বলে। মনস্তত্ত্বে একধরনের রোগের নাম ‘সামগ্রিক আসক্তি’। এই ধরনের ফোবিয়ায় আক্রান্তদের কোনো বস্তু পছন্দ হলেই সেয়েছে! যেখান থেকে যেভাবেই হোক, সেই জিনিস তাকে সংগ্রহ করতেই হবে। যেমন : পেনসিলের মতো হিল জুতার ব্যাপারে কোনো পুরুষের দুর্বলতা তৈরি হলে সে যে মেয়ের কাছেই তা দেখবে, তার সঙ্গে একটি সংযোগ ও সম্পর্ক অনুভব করবে। এজন্য মেয়েটির সুন্দরী হওয়া একেবারেই আবশ্যিক নয়।

ফ্যাশনের বেলায় রুচির বিকৃতি আর বস্ত্রসামগ্রীর প্রতি আসক্তি—দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, ডোরাকাটা ও রং-বেরঙের উদ্ভট পোশাক পছন্দ ও পরিধান কেবল ফ্যাশনে বিকৃত রুচির সূচকই নয়; বরং নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ করার সচেতন কসরত।

ভারতে একসময় কুস্তিগির পলোয়ানরা রেশমি কাপড়ে বেনারসির কাজ করা রুমাল গলায় বাঁধত। এরপর শুরু হয় ভুসকি ধরনের কাপড়ের মাফলার পরার রেওয়াজ। সম্প্রতি গান-বাজনা ও নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত লোকদের প্রায় সব ধরনের মেয়েলি পোশাক পরতে দেখা যাচ্ছে। জামদানি, ব্রেভকাট স্কার্ট তো হরদম গুরুত্বের সঙ্গেই পরা হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু পুরুষরা গলায় একধরনের চিকন সুতা<sup>১</sup> ঝুলিয়ে রাখে। ধনী শ্রেণির হিন্দুরা এর সঙ্গে ব্যবহার করে স্বর্ণের চেইন। আজকাল সর্বত্র প্রায় অধিকাংশ উঠতি তরুণের গলায়ও নানান কারুকার্যময় সোনার চেইন দেখা যায়। পুরুষদের জন্য এসব রেশমি কাপড়, গলায় সোনার চেইন ও ভিন্ন সংস্কৃতির অনুকরণপ্রবণতা হীনম্মন্যতার প্রতিফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

আলি (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ডান হাতে রেশমি কাপড় ও বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বলেছেন—‘এই দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।’<sup>২</sup> একই প্রসঙ্গে সুনানে নাসায়িতে আবু মুসা (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা পাওয়া যায়—‘উম্মতে মুহাম্মাদির পুরুষদের ওপর স্বর্ণ ও রেশমি কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’ কোনো কোনো বর্ণনায় এমনকী মেয়েদের জন্যও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষত, ফাতেমাতুজ জহুরা (রা.)-এর কাছে স্বর্ণের হার দেখে রাসূলের অসন্তোষের দ্বিতীয় কারণটি হয়তো এই অর্থনৈতিক তাৎপর্যের মধ্যে নিহিত। ইসলামি জীবনব্যবস্থার জন্য এমনটি মোটেই শোভনীয় নয় যে, জাতি ও রাষ্ট্রের

১. বাংলাদেশে সম্ভবত এটাকে পৈতাও বলা হয়।

২. তিরমিজি, আবু দাউদ

সম্পদের একটি বড়ো অংশ এক জায়গায় অনুৎপাদনশীল অবস্থায় পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। এ কারণেই ইসলাম অলংকারাদির ওপর জাকাতের বিধান আরোপ করেছে।

একদল জার্মান চিকিৎসক নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, সময়ের সাথে সাথে তাদের হরমোনের গঠনগত অবস্থার মধ্যে কিছু পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। ফলে তাদের দৈহিক কাঠামোতেও খানিকটা বদল ঘটে। এভাবে পুরুষের রক্তে মেয়েলি হরমোন বেড়ে যাওয়ার ফলে তার ভেতর জন্ম নিতে পারে নারীসুলভ অভিব্যক্তি। আর এটা নিশ্চিতভাবেই নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একটি নেতিবাচক অবস্থা।

লক্ষ্মী শহরে ‘জান সাহেব’ নামের একজন কবি বাস করতেন। কবিতায় ‘তাখাললুস’ রীতি অনুসরণ করতেন তিনি। এজন্য কবিতার আসরে প্রায়শই হাজির হতেন মেয়েলি পোশাক পরে। নারী সম্বন্ধীয় কবিতার জন্য বিস্তর পুরস্কারও পেতেন শ্রোতাদের কাছ থেকে। কবি ও শিল্পী হিসেবে তিনি মোটেও গণনার যোগ্য কেউ ছিলেন না; কিন্তু মেয়েলি অঙ্গভঙ্গি, আবেদনময়ী সুর-ছন্দ ও সুড়সুড়িমূলক হাবভাব দেখিয়েই মোহগ্রস্ত করে রেখেছিলেন বিপুল পরিমাণ দর্শক-শ্রোতা। এই কবিতার আসরে মাঝারি মানের আরও একজন পুরুষ কবি হাজির থাকলেও তার কোনো কবিতা পুরস্কারের নাগাল পেত না। মোদাকথা, তার জীবন কোনো সুস্থ মানুষের জীবন ছিল না। মানসিক বিকৃতির একপর্যায়ে শেষমেশ সে পুরোপুরি পাগল হয়ে যায়।

মহানবি ﷺ-এর প্রত্যেকটি অপছন্দ ও নিষেধাজ্ঞার নেপথ্যে সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতা ও মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে। যদিও শুরুতে আমরা অনেকেই এটি সম্বন্ধে চূড়ান্ত উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলি। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাত্রটি সাতবার ধুয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে কমপক্ষে একবার ধুয়ে নিতে বলা হয়েছে মাটি দ্বারা। এই নির্দেশনার সঙ্গে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে বিবৃতি মিলিয়ে দেখুন—যেখানে অপর প্রাণী ছিঁড়ে-ফেড়ে খাওয়া মাংসাশী হিংস্র জন্তুর গোশত হারাম করা হয়েছে। কুরআনের এ বিধান থেকে একটি ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কুকুর ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর মুখে নিশ্চয়ই এমন কোনো বিষাক্ত জিনিস থাকে, যা মানুষের খাদ্যে মিশে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানবদেহ। সপ্তম শতকের পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে এটা জানা ছিল অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির পর আজ আমরা প্রমাণ পেয়েছি, হিংস্র প্রাণীর লালায় বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে।

## স্বপ্নলোকের নানান কথা

মানুষ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে—এটা কে না জানে? কিন্তু আজকের দিনে মনোবিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেছেন, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরাও স্বপ্ন দেখে; এমনকী গরু, মহিষ, কুকুর-বিড়ালও এই তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। একদল বিশেষজ্ঞ তো আরও এক ধাপ এগিয়ে গ্যারান্টি দিচ্ছেন—স্বপ্ন পাখিরাও দেখে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি মানুষের ক্ষেত্রে মূলত কীভাবে ঘটে? ঘুমানোর সময় মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টিলেঢালা হয়ে যায়, কিন্তু স্বপ্ন শুরু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ চোখ দুটো ঘুরতে থাকে প্রবল বেগে। মগজে ঘটতে থাকে বৈদ্যুতিক পরিবর্তন। যন্ত্রের মাধ্যমে আজকাল এটি রেকর্ড করা সম্ভব। এ ছাড়া মুখগহ্বরের পেছনের দিকে আলজিহ্বা সংশ্লিষ্ট অংশ নড়াচড়া করতে থাকে তখন। বেড়ে যায় নিশ্বাসের গতিবেগ। হৃৎক্রিয়ায় অনুভূত হয় কিছুটা অতিরিক্ত আলোড়ন। ফ্রান্সের একদল বিশেষজ্ঞের বক্তব্য হলো, দৈনিক আট ঘণ্টার ঘুমের মধ্যে দেড় ঘণ্টাই থাকে স্বপ্নের দখলে।

স্বপ্নকে তুলনা করা যেতে পারে কোনো চলমান কাহিনির সাথে। চলচ্চিত্রের মতো এরও বিচিত্র দৃশ্য আছে, আছে প্রতিবেশ ও নানা ঘটনাবলি। মগজের স্ক্রিনে ফিল্মের মতোই প্রতিফলিত হয় সেসব। আবার কখনো স্বপ্নই হয়ে ওঠে একটি মানসিক রোগ। সুস্থ মানুষ যা অবচেতনে দেখে, মাদক সেবনকারী তা দেখে জাগ্রত অবস্থায়। এই রোগকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে—এলএসডি। এটা শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণের মতোই অলীক কল্পনা। পক্ষান্তরে স্বপ্ন কখনো নিজের ইচ্ছেমতো দেখা যায় না। কাউকে একটা গল্পের প্রথমাংশ বর্ণনা করে বলা যায় না, বাকিটা স্বপ্নে দেখে নিয়ো। তবে হিপ্টোনাইজ বা সন্মোহনের সময় ব্যক্তিকে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হলে সময়ের চলমান অবস্থায় সেটি কার্যকর হলেও হতে পারে।

একবার এক লোক দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের পর তাকে অজ্ঞান করে দাঁতটি উপড়ে ফেললেন চিকিৎসক। আর হুঁশ ফিরে আসা অবধি যাবতীয় কাজগুলো সম্পন্ন করতে সর্বসাকুল্যে সময় অতিবাহিত হয়েছে মাত্র এক থেকে দেড় মিনিট। জ্ঞান ফেরার পরপরই রোগী দেখলেন, ডাক্তারের হাতে তার দাঁত। তার চোখ ছলছল করছিল অশ্রুতে; অথচ কোনো ব্যথাই টের পাননি তিনি। ডাক্তার সাহেব কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় এক দীর্ঘ স্বপ্নের অসম্পূর্ণ সারাংশ পুরো পাঁচ মিনিট ধরে বর্ণনা করলেন। সেই স্বপ্নের কাহিনিতে তিনি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ও বেদনাদায়ক অবস্থার মুখোমুখি হন, যার ফলে জল চলে এসেছিল তার চোখে। ভাবনার বিষয় হলো—এই এক মিনিটের কম সময়ে তিনি এত দীর্ঘ স্বপ্ন কীভাবে দেখলেন? তার বর্ণনা ও স্বপ্নশাস্ত্রের বিশ্লেষণকে পাশাপাশি রেখে এর ব্যাখ্যা

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, স্বপ্নের বিস্তারকে কুদরতি উপায়ে এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয় যে, স্বপ্নে যেই কাহিনি পুরো রাতভর দৃশ্যায়িত হয়েছে, বাস্তবে তা ঘটেছে মাত্র আধঘণ্টায়।

স্বপ্নের সময় চোখের ঘূর্ণন আর জিহ্বামূলের দ্রুত কম্পন পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসকগণ একটি সফল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আর তা হলো—স্বপ্নাবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে জাগানো হলে প্রতি ২৭ জনের মধ্যে ২০ জন বলেছেন, তারা স্বপ্ন দেখছিলেন। অন্যদিকে স্থির চোখ ও সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসরত অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানোর পর তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ চার ব্যক্তি স্বপ্ন দেখার বিষয়ে পরিকারভাবে জানিয়েছেন। যাদের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও চোখ ঘুরতে থাকা অবস্থায় জাগানো হয়েছে, তারা স্বপ্নের বর্ণনা দিতে পেরেছেন সমধিক স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে। অথচ চোখ সম্পূর্ণ স্থির হয়ে যাওয়ার পর জাগানো হয়েছে এমন লোকদের স্বপ্নের বিবরণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে বেগ পেতে হয়েছে; অধিকাংশ ব্যক্তি বেমালুম ভুলে গেছে তাদের স্বপ্নের স্মৃতি।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষজ্ঞ ও মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ হলো, সাধারণত নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার ১০০ মিনিট পর চোখের নড়াচড়া শুরু হয়ে যায় এবং সেটি স্থায়ী হয় আনুমানিক ১০ মিনিটের মতো। এরপর প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর অন্তর এরূপ অবস্থা ফিরে ফিরে আসে। এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকে ঘুমের শেষ পর্যন্ত। দুষ্কপোষ্য শিশুদের ঘুমের অর্ধেকটাই কাটে এই অবস্থায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই হ্রাস পেয়ে ৬০ বছর অবধি তা নিদ্রাকালের ২০%-এ নেমে আসে। স্বপ্নের অধিকাংশ কাহিনি হয় এলোমেলো। এর কোনো সোজাসাপ্টা অর্থ বের করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই কারণে স্বপ্নের বিবরণ সকাল সকাল শুনে নেওয়াই ভালো, নয়তো কাহিনির অধিকাংশ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য কাউন্সিলিং বিশেষজ্ঞরা রোগীর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের বর্ণনা লিখে ফেলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি রীতি সম্পর্কে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বলেন—‘ফজরের নামাজের পরপরই তিনি সাহাবিদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিতেন, “গত রাতে তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছে?”’ ভোরবেলায় লোকজনকে তাদের স্বপ্ন বর্ণনায় উদ্বুদ্ধ করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, সারাদিনের বিবিধ পেরেশানি থেকে মুক্ত অবস্থায় স্বপ্নের বিশ্লেষণ শিক্ষা দেওয়া।

### স্বপ্ন ব্যাখ্যার সনাতন পদ্ধতি

কানাডার হিডসন নদীর তীরে বসবাসরত লোকেরা বিশ্বাস করত, স্বপ্ন দেখার সময় ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রাণ দেহ থেকে বের হয়ে যায়। অতঃপর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে গিয়ে স্বপ্ন দেখে আসে। এই অবস্থায় জাগানো হলে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পথ ভুলে যেতে পারে তার প্রাণ। যথাসময়ে দেহে ফিরে আসতে ব্যর্থ হলে মারাও যেতে পারে লোকটি। অনুরূপ নওরান উপত্যকার লোকদের কাছেও ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অকস্মাৎ জাগিয়ে দেওয়া ছিল নিন্দনীয়। আবার ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপগুলোর বাসিন্দাদের মাঝে এক অদ্ভুত রেওয়াজ ছিল। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া চলাফেরা করা অবস্থায় স্বপ্নে দেখলে পরের দিন ভোরে স্বশ্রুতকে ডেকে বলত—‘তোমার চরিত্রহীন মেয়েটি দয়া করে বাড়ি নিয়ে যাও।’

## আত্মহত্যা ও ইসলাম

নিজের হাতে কেউ নিজেকে শেষ করে দিতে চাইলে, তাকে বলা হয় আত্মহত্যা। আইনের চোখে এ কাজটি অপরাধ। তবে মজার ব্যাপার হলো—আত্মহত্যায় সফল হয়ে মারা গেলে সংবিধান মতে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা চলে না। রাষ্ট্র নিজেও বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না। কিন্তু মরতে মরতে বেঁচে গেলে, আইন অনুযায়ী তার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানীরা আত্মহত্যাকে আরও ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেন। তারা বলেন— আত্মহত্যা কোনো ব্যক্তির জীবৎকালে এমন কোনো কর্ম, যাতে তার সুস্থতা বিঘ্নিত হয় অথবা জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয় কিংবা অস্তিত্ব বিপন্নতার মুখোমুখি হয়। যেমন : উচ্চ গতিতে মোটরসাইকেল চালালে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কিন্তু দ্রুত গতির সাথে হাত ছেড়ে দিয়ে অথবা অন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পন্থায় মোটরসাইকেল চালালে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। এমন বেপরোয়া ড্রাইভিংয়ের ফলে মৃত্যুকেও মনোবিদগণ গণ্য করবেন আত্মহত্যা হিসেবে।

যেসব কাজ ও পদক্ষেপে নিজের প্রাণের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞায় সে সবকিছুকেই আত্মহত্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আত্মহত্যা শুধু বর্তমান যুগের সমস্যা নয়। এ সমস্যা মানবজাতির সূচনালগ্ন থেকেই একটা যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং এখনও আছে। কোনো মানুষ আত্মহত্যা করলে প্রত্যেকেরই উচিত তার জন্য আফসোস করা। কারণ, এর ফলে একটা মূল্যবান জীবন শেষ হয়ে গেল। কিন্তু একটা বিশেষ শ্রেণি এতে খুবই খুশি হয়; বরং এটাকে তারা গণ্য করে সম্মানজনক প্রস্থান ও ব্যক্তির চূড়ান্ত মুক্তি বলে।

নিজেকে নিজে শেষ করে দেওয়া কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাজ হতে পারে না; কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দল, মতবাদ, ধর্ম ও সমাজ এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করেনি। তাওরাত আর ইনজিলেও এ বিষয়ে কোনো বিধিবিধান নেই; বরং পুরাতন বাইবেলে এমন চারটি ঘটনা পাওয়া যায়, যেখানে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পরিবর্তে আত্মহত্যা করেছে ব্যক্তি। জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার এই মনোবৃত্তির দেখা মেলে গ্রিক দর্শনেও। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরুরা যদিও এটার নিন্দা করে, কিন্তু তাদের কথায় এটাকে খারাপ বলার না কোনো দলিল-প্রমাণ আছে, আর না তাদের ধর্মে আছে এটাকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার কোনো পন্থা।

ইসলামই পৃথিবীর এমন এক অনুপম জীবনব্যবস্থা, যেখানে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলাম শুধু আত্মহত্যাকে নাজায়েজ আর আত্মহত্যাকারীকে জাহান্নামি বলে ক্ষান্ত হয়নি; বরং আত্মহত্যা করার যত কারণ থাকতে পারে, তার সবগুলো উল্লেখ করে বাতলে দিয়েছে মুক্তির পথ ও পদ্ধতি। এর ফলে কেউ আর আত্মহত্যার কল্পনাও করবে না। রাসূল ﷺ-এর পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রভাবে সত্যিকারের কোনো মুসলমান জীবনে কখনো এতটা হতাশ হতেই পারে না, যার কারণে মনে আত্মহত্যার চিন্তা আসে। কিন্তু বিপরীতে অন্য ধর্মগুলোতে যারা আপন ধর্মের প্রতি অধিক বেশি ঝুঁকে পড়ে, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। ধর্মীয় আকর্ষণই তাদের জন্য আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দু ধর্মে মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়; বরং মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির আত্মা বিভিন্ন কিছুর আকৃতি ধারণ করে দুনিয়াতে বারবার ফিরে আসে। জীবদ্দশায় যারা ছিল সৎ ও পরহিতৈষী, তারা মৃত্যুর পর ফিরে আসে উৎকৃষ্ট কিছুর আকৃতি নিয়ে আর খারাপ ব্যক্তি আসে নিকৃষ্ট আকৃতিতে। হতে পারে সে পরের জন্মে গাধা, ঘোড়া বা কুকুর হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। মোটকথা, তাদের ধর্মানুসারে আত্মা ফিরে আসার এই বিষয়টি নির্ভর করে কর্মফলের ওপর। এ হিসেবে হিন্দু ধর্মে ব্যক্তির জন্য আত্মহত্যা করতে কোনো বাধা নেই। কেননা, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে আবার পৃথিবীতে চলে আসতে পারছে। তা সত্ত্বেও ধর্মের নামে জাতপাত ও বর্ণ-গোষ্ঠীর সম্মান রক্ষার্থে স্বামীর চিতায় যেসব মহিলা হাসি মুখে আত্মহুতি দেয়, তাদের মধ্যে খুব কম মহিলাই আছে, যারা নিজের খুশিতে তা করে। প্রথমে তারা এই মহিলাদের জীবনকে করে তোলে বিষবৎ যন্ত্রণাদায়ক। তারপর গাঁজা, ভাং ইত্যাদি খাইয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় স্বামীর চিতায়। এতটা বর্বর যে ধর্মীয় সংস্কৃতি, আত্মহত্যা সেখানে কী আর এমন ব্যাপার!

আমেরিকায় এক ঠাকুর লোকদের নরক আর পাপ থেকে থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বসতি স্থাপন করে। এরপর আত্মার প্রশান্তির কথা বলে প্ররোচিত করে নেশাদার দ্রব্য সেবনের দিকে। এভাবে লোকটি ক্রমেই সবাইকে মাদকাসক্ত ও বিপথগামী করে ছাড়ল। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে এসে পুরো আস্তানা ঘিরে ফেলে। পুলিশ এসেছে জানতে পেরে ঠাকুর ভাবল, অশ্লীলতা ছড়ানো এবং মাদকদ্রব্য বিক্রির দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হবে। তখন সে তার ভক্ত-অনুরক্তদের একত্র করে ঈশ্বরের শান্তি ও নরকের ভয় দেখিয়ে বলল-‘আজ যদি সবাই আত্মহত্যা করে, তাহলে স্বর্গ নিশ্চিত।’ এভাবে স্বর্গের লোভ আর নরকের ভয়ে পরদিন ৮০০ মহিলা ও শিশু বালতিতে বিষ গুলিয়ে পান করল ঠাকুরের সাথে।

### আত্মহত্যার আন্তর্জাতিক চিত্র

যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের আত্মহত্যা নিয়ে গবেষণা করে আসছে। কেন মানুষ আত্মহত্যা করে? এর পেছনে অনুঘটকগুলো কী? এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো জানতে চেয়েছেন তারা। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছেন-আত্মহত্যা কারা করে? কেন করে এবং কখন করে? তাদের বয়স ও শারীরিক গঠনের সাথে এর সম্পর্কটাই-বা কী? ফ্রান্সের প্রতি



এক লাখ সামরিক বাহিনীতে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, তরুণ ও যুবক সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। নিচের ছকে তা তুলে ধরা হলো—

বছর	পদাতিক সৈন্য	নৌবাহিনী	সাধারণ লোকদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান
১৮৯০	৫৫	...	২৭
১৯১৩	৪৩	৪৬	২৩
১৯২৪	১১০	১৪১	২১
১৯৩৪	৩৮	৩৯	২৯
মোট	২৪৬	২২৬	১০০

জরিপটি থেকে স্পষ্ট, সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় দেশটির সেনাবাহিনীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এসব পরিসংখ্যান দেখলে অবাক হতে হয়। চারদিকে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মানুষের অবস্থা মারাত্মক বিপন্ন, তখন আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের দিনগুলোতে আত্মহত্যার কারণ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সে সময় আত্মহত্যার ঘটনা নেমে এসেছে ২৪ শতাংশে। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধের সময়ে সেটা কমে হয়েছে ১৯%। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

দেশ	শতকরা হার
ফ্রান্স	৩৯%
আমেরিকা	৩৬%
ইংল্যান্ড	২৫%
সুইডেন	৩০%
সুইজারল্যান্ড	৪৬%